

সমাজকল্যাণ ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুমিত পাল

গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যারাকপুর পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ড. সন্তোষ মুখার্জী

অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ড. সমীর রঞ্জন অধিকারী

অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,

সিধো- কানহু বীরসা ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ভূমিকা:

কল্লোল যুগে বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যে যে আধুনিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর নিজস্ব রচনায় তার শ্রী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। তরুণ ও তরুণতর কবিদের সঙ্গে নতুনকালের কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে মানুষ যতীন্দ্রমোহনের সম্পর্ক ছিল গভীর ও অন্তরঙ্গ। কল্লোলের অন্যতম সদস্য নিপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহনের সান্নিধ্যে এসে নজরুল ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে সমৃদ্ধ হন। বিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি এবং নদিয়া জেলার অন্যতম সমাজ সচেতন সুনামগরিক ও কবি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। তাঁর সময়কাল ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু, স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উত্তাল পর্ব। কাজী নজরুল ইসলাম ‘কল্লোল’ এর সদস্যদের সাথে নিয়ে ‘ধুমকেতু’ নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে লিখছেন-

“কারার ওই লৌহ কপাট

ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট

রক্ত জমাট, শিকল পূজার পাষণবদী”।

ঠিক এই সময় কালে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ির বৈঠকখানায় কলকাতার সেরা মজলিস বসত। বহুগুণী গায়ক ও সাহিত্যিক সেই মজলিসে এসে উপস্থিত হতেন। সেই মজলিসের প্রধান দায়িত্বে থাকতেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। অতিথি বাৎসল্যে যতীন্দ্রমোহনের সুনাম ছিল নগর জুড়ে। যেকোনো কারোর মধ্যে মৃদু তম সম্ভাবনা থাকলে তাকে উৎসাহিত করতেন, আভাস একবার পেলেই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে আশ্বাস করে আনতেন। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব

না থাকলেও পরোক্ষ প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সারির বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধীজী, বাঘাযতীনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল সমাজকল্যাণ ভাবনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

সমাজকল্যাণ ভাবনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল- “সমাজকল্যাণ ভাবনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদান কী” ?

গবেষণা পদ্ধতি:

এই গবেষণাটি আসলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research)। বিশেষত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালিত করা হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি:

উপাত্ত গবেষণার অন্যতম সহায়ক। উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। উপাত্ত গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data):

প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্বরচিত গ্রন্থ গুলি বিবেচিত হয়েছে। যেমন লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী ইত্যাদি।

(আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary data): বর্তমান গবেষণায় গৌণ উপাত্ত হিসেবে যে বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে সেগুলি হল –

(ক) যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনী তথ্য,

(খ) তাঁর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত বহুবিধ লেখক-এর আলোচনা,

(গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ,

(ঘ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত লেখা),

(ঙ) মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নথিপত্র প্রভৃতি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ:

ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত ও নানা মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত গৌণ উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ বর্ণনার একটি গবেষণা কৌশল হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সামাজিক নিদর্শন, শিল্প-কর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র ও অন্যান্য দৃষ্টিকার্য মৌখিক ও লিখিত বিভিন্ন ডকুমেন্ট এই পদ্ধতিতে উৎসের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত গুলি বিশ্লেষণ

পদ্ধতিতে তথ্য নিষ্কাশন করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে আরও বোঝা গেছে কবি যতীন্দ্রমোহন শিশু পাঠ্যপুস্তক অনেক বই তিনি লিখে গেছেন। তাঁর রচনায় সমকালীন রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব বর্তমান। তাঁকে রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান সাহিত্যিক হিসেবে যেমন বিবেচনা করা হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সমাজ কল্যাণ ভাবনায় কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচীর ভূমিকা অন্যতম।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণা কর্ম সমাপ্তের উপর নির্ভর করে, গবেষণা কর্মের ফলাফল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উঠে আসবে, তার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল গৃহীত হয়েছে।

নারী কল্যাণ ভাবনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

তাঁর কলমে বিচিত্র নারী ভাবনার বৈচিত্র্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় অভিজ্ঞতা সঞ্চিত বিচিত্র গ্রামীণ নারীদের মনমধ্যে প্রবেশ করে তাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইসময়ের দুঃস্থ মহিলাদের দুঃখ কষ্টের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী জাত-পাতহীন, শ্রেণী বৈষম্য, কুসংস্কার থেকে মুক্ত একটি আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এক কথায় বলতে গেলে যতীন্দ্রমোহন বাগচী যতদিন বেঁচে ছিলেন তিনি উজার করে আমাদের দিয়ে গেছেন ইহজগতে অর্জিত তাঁর সমস্ত সৃষ্টি, শিক্ষা অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা। অন্যদিকে বঞ্চিত নারীর হৃদয় বেদনার কথা তিনি তাঁর “অন্ধবধূ” কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বহু কবিতাতেই নিরক্ষর দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক দিনলিপির চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর ‘জেলের ছেলে’, ‘জেলের মেয়ে’, ‘চাষার মেয়ের গান’ প্রভৃতি কবিতাগুলি দরিদ্র সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড় অনুভব এবং পল্লীজীবনের অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সামাজিক চিন্তন:

সমাজ সংস্কারে ও তাঁর অনন্য সাধারণ ভূমিকা বাঙালি জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নদীয়ার জলঙ্গী নদীর অববাহিকায় জমশেরপুর, করিমপুর, তাজপুর, আলিপুর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে বসবাসকারী দরিদ্র মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোকপাত করেছেন এবং সমাজ চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী স্বরচিত “পল্লীকথা” প্রবন্ধে কবির সমাজ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় করিমপুর ও তার পার্শ্ববর্তী সৎলঙ্গ এলাকা, রাস্তাঘাট এবং পল্লী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের করণ চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর লেখনীতে। কবির যেখানে জন্মস্থান, নদীয়ার জমশেরপুর এখন বর্তমান করিমপুর থানার অন্তর্গত। এই করিমপুর এক সময় কবির জন্মভূমি এলাকার মহকুমা ছিল। কিন্তু কি কারণবশত সেই মহকুমা মেহেরপুরে স্থানান্তরিত হয়, সেটি পরিষ্কারভাবে কবি তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। শিকারপুরের নীলকুঠি, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা তিনি লিখেছিলেন। কবি ভীষণ সচেতনভাবে সমাজের অন্যায়

অনাচার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য। তিনি ভীষণ দায়িত্ববান ছিলেন মানবতার প্রতি ও সমাজের প্রতি।

যতীন্দ্রমোহনের স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনা:

ছাত্রাবস্থা থেকেই যতীন্দ্রমোহন সামাজিক নানা ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি যখন কলেজের ছাত্র, তখন কলকাতায় বিডন পার্কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োদশ বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সেই সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ নিজে সুর দিয়ে বন্দেমাতরম গানটি গেয়েছিলেন কোরাসে। সেখানে গান্ধিজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের সেই অধিবেশনে যতীন্দ্রমোহন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। ‘বন্দেমাতরম’ জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত কিনা, সেই বিষয়ে এক সময়ে ভারতবাসী একটি মতভেদ তৈরি হলে সেই সিদ্ধান্তের অনুলিপি গান্ধিজিকে পাঠানো হয়। সেই সিদ্ধান্তপত্রটি যতীন্দ্রমোহন স্বহস্তে লিখেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন রচিত একমাত্র উপন্যাস ‘পথের সাথী’ তে আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে একজন সৎ পরিশ্রমী মানুষ নিজেকে উজাড় করে অন্যের উপকার করে, এবং দেশকে ভালোবাসে।

স্থানীয় এলাকার ইতিহাস রচনা ও সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধান যতীন্দ্রমোহন:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত ‘পল্লী-কথা’ প্রবন্ধে নদীয়ার করিমপুর এবং তদসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সূত্রে করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোড়াদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর নামক গ্রামগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রকৃতির নির্মমতায় কৃষি কার্যের অসুবিধার দরুন দেশের অকাল ও সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ তিনি অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর রচনায়-

“পদ্মানদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধোড়াদহ, মোক্তারপুর, গোঘাটা, ত্রিহুট, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পূর্বপারে অবস্থিত।” (যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১৬০)

“নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাদের বিশেষ উপযোগী ছিল। পূর্বোক্তখিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে চাষীদিগের প্রথম বসবাসের কারণ।” (যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৬০)

“অধুনা এ প্রদেশে কৃষি কার্যের বিশেষ অসুবিধা। প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, বন্যাও প্রায় আসে না, বিল খাল বা বৃহৎ জলাশয় ও নালারও একান্ত অভাব;..... সময়ে বৃষ্টি হয় না, বা অতিবর্ষণ হয়, সে বৎসর “অজন্মা” হওয়াতে দেশে ‘অকাল’ লাগে।” (যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১৬১)

“পূর্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে ফৌজ লইয়া গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড়ো বড়ো স্টিমার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া বহুস্থানে যাইত।” (যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১৬১)

আঞ্চলিক সমাজ কল্যাণ সাধনে বাগচী জমিদার পরিবার:

করিমপুরের জমশেরপুর একটি ছোট গ্রাম। বাগচী বাবুরা এই গ্রামের জমিদার বংশজাত। বাগচী পরিবারের জমশেরপুরে আগমন বৈবাহিক সূত্রে। যতীন্দ্রমোহনের পূর্বপুরুষ রামভদ্র বাগচী ১০৫১ সালে জমশের পুরের পশ্চিমে অবস্থিত সুন্দলপুরে আসেন। এরপর ১০৫৩ সালে তিনি জমশেরপুরে পাকাপাকিভাবে বসতবাড়ি গড়ে তোলেন। পুরাতন বাড়ির মালিক জমিদার নারায়ণ বাগচীর অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণের জমিদারির অংশ যমশেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়কে দান করেন, এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিদ্যালয়টির নাম রাখেন ‘যমশেরপুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়’। অপর দিকে, রামগঙ্গা বাগচীর প্রথম পুত্র কৃষ্ণনারায়ণের স্ত্রী ভবসুন্দরী দেবীর নামে স্কুল সংলগ্ন ‘ভবসুন্দরী হিন্দু হোস্টেল’ প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখনো বর্তমান।

এই বাগচী পরিবার যমশেরপুর গ্রামকে আদর্শপন্থিতে উন্নীত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হরিমোহন দাতব্য চিকিৎসালয়, বড় ডাকঘর, ইট-বিছানো সদর রাস্তা, একাধিক পুকুর, পানীয় জলের জন্য বড় বড় কুয়ো, শিশুদের খেলাধুলো করার জন্য গ্রামের মধ্যে হিতসাধনী মাঠ ইত্যাদি স্থাপন। এছাড়াও যতীন্দ্রমোহনের লেখায় জানা যায় আরবপুরের জমিদারের একবার ভয়ানক জল কষ্ট হয়েছিল, সেই কষ্ট নিবারনে বাগচী বাবুরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং সম্পূর্ণ সাহায্য করেছিলেন।

জাতিভেদের বিরুদ্ধে যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা একটি অন্যতম অভিশাপ। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এই জাতিভেদ প্রথা ছিল প্রবল। নিচু জাতির মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করা হত না। তাদেরকে সমাজ বিভিন্ন রকম ভাবে হেনস্থা করত। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষেরা সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ভাবে হেনস্থা করত। হিন্দু ধর্মের মানুষেরা সেই সময় জাতিগতভাবে বিভিন্ন পেশা নির্বাচন করত। যা তার লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ রাজপুত বাদ দিয়ে শূদ্র জাতীয় চন্ডাল গন্ডক ও কাননি নামক তিনটি শ্রেণীর জাতি দেখা যায়। কাননি জাতি সাধারণত সূত্রধরের কাজ করতো ও চন্ডালের পান বিক্রয় করতো। (বাগচী ১৩১২ সন ১০৯ - ১১০) এই জাতিভেদের প্রথার বিরুদ্ধে যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যতীন্দ্রমোহন বাগচী আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিন্দা ও বারণ উপেক্ষা করে তার স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধু নলিনাক্ষ সান্যাল ও ড. জ্ঞানেশ নারায়ণ বাগচীর সহায়তায় নিজগ্রামে ‘জলতল’ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সেই আন্দোলনকে সর্বপ্রকারে সফল করার যাবতীয় চেষ্টা করেছিলেন। সেই সভায় প্রথমেই কবি নমঃশূদ্র পরিবারের থেকে জলপান করে সেই যুগে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কুসংস্কার ভাঙার সূচনা করেন এবং সফলও হন।

সৌভ্রাতৃত্বের বন্দনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

কবির জন্মস্থান করিমপুরের জমশেরপুর এলাকায় সব রকম ধর্মের মানুষের বসবাস আগেও ছিল এখনো তা বর্তমান। দেশভাগের আগে বঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাতৃত্বের কথা তার লেখনীতে ফুটে ওঠে। প্রাবন্ধিকের বক্তব্য থেকে জানা যায় –

“হিন্দুর পূজা - পার্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব উপলক্ষে হিন্দুর দায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণত এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্য পীরের পূজা করিয়া থাকে ওই পূজা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্ধি বা প্রসাদ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্ব পরিলক্ষিত হয় তাহার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা ও অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পূজার সময় তাহারা দণ্ডুর কাগজপত্র প্রতিমা চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমান কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু ও মুসলমানের দ্বারা একত্রেও গীত হইয়া থাকে”। (যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা- ১৬২)

পল্লী গ্রামে সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন ভাবনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

নলিনাক্ষ সান্যাল এর পূর্ব লিখিত থেকে আমরা জানতে পারি সেই সময়ের বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তার সহকর্মীদের সাথে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এরপর জমশেরপুর গ্রামে তিনি নাটকের আয়োজন করতেন এবং নিজে নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিনয়ের মাধ্যমে অন্যদেরকে অভিনয়ে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতেন। শুধু শহর কলকাতাতে নয়, সুদূর পল্লীগ্রামে শারদ উৎসব উপলক্ষে তিনি সাহিত্যিক ও গুণীজনদের আমন্ত্রণ করতেন। সেই সময় কলকাতা থেকে নদিয়ার জমশেরপুর গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ কঠিন ছিল। শিয়ালদহ থেকে মেহেরপুর স্টেশনে (বর্তমান বাংলাদেশ) নেমে সেখান থেকে বাইশ মাইল গরুর গাড়িতে গিয়ে ‘কবিগৃহ’ যমশেরপুর পৌঁছানো যেত। এত কষ্ট স্বীকার করেও গুণীজনরা কবিগৃহে এসেছেন এবং তাঁদের আগমন উপলক্ষে কবি অনেক অনুষ্ঠান করে তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন। কবির আমন্ত্রণে নজরুল ইসলামও বেশ কয়েকবার যমশেরপুর গ্রামে এসেছেন। বাংলা বা বাঙালি কবি যতীন্দ্রমোহনকে কতটা মনে রেখেছে— এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলা যায়, নদিয়া জেলার বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যমশেরপুর গ্রামের কবিকে নিয়ে বৃহত্তর এলাকার মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। তাঁর এই সামান্য সাধনার আস্থানে যমশেরপুর গ্রামের মাটিকে এক দিন ধন্য করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের মতো বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকরা।

কল্লোল যুগের ব্যতিক্রমী যতীন্দ্রমোহন:

যতীন্দ্রমোহনের কবি জীবনে সাহিত্য সমাজের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র সাহিত্য যুগে সাহিত্যিকদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা থাকলেও যতীন্দ্রমোহন

ছিলেন সকল সাহিত্যিকদের দলাদলির উর্ধ্ব। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কিরনধন চট্টোপাধ্যায় এবং কালিদাস রায়ের সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। যতীন্দ্রমোহনের সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে উদারতা ও হৃদয়বত্তার বড় নিদর্শন পাওয়া যায়, তরুণ কবিদের রচনার মধ্যে। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আরপুলিলেনের বাড়িতে রবীন্দ্র যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ৩ দশকের কবি ও লেখকের সম্মেলন হয়েছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর থেকে সাড়ে আট বছরের ছোট হলেও, কবি যতীন্দ্রমোহন তাকে মিতে সম্মোদন করে ডাকতেন। যশ অর্থ প্রতিপত্তি এবং অন্যদিকে মানসী পত্রিকার সম্পাদক যতীন্দ্রমোহনের কোন অহং বোধ ছিল না, সকলের সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি কাজী নজরুল ইসলামকে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ কাব্য সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলেন। একই রকম ভাবে মোহিতলাল মজুমদারকে ও যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাকে তার প্রাপ্য সম্মান পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী অতিথিদের ভীষণভাবে আপ্যায়ন করতেন। যে কোন নতুন প্রতিভাকে তিনি উৎসাহিত করতেন এবং সে যাতে তার প্রাপ্য মর্যাদা পায় তার ব্যবস্থা করে দিতেন। কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন, এর ফলে বহু গুণী গায়ক ও সাহিত্যিক কবির বাড়ির বৈঠকখানায় আসতেন এবং কবি যেমন তাদের আপ্যায়নের কোন ক্রটি রাখতেন না, ঠিক একই রকম ভাবে সেই সময়কালের সকল গুণী কবি সাহিত্যিকরা তাকে প্রধান আসনে রেখে ভীষণ সম্মান করতেন।

উপসংহার:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী একজন সামাজিক উদার মনভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের পরোক্ষভাবে সাহায্য করে তিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন কে ত্বরান্বিত করেছিলেন। তিনি যেমন তার লেখায় পল্লীগ্রামের ইতিহাসকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন, যা পরবর্তী প্রজন্মের ইতিহাস পাঠে সহযোগিতা করবে। ঠিক একই রকম গ্রামের নির্যাতিত নিপীড়িত নারীদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর লেখায় তিনি জাত পাতের উর্ধ্ব গিয়ে সকল মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন। গ্রামের দুঃখ, দারিদ্র্য, কুৎসিত গ্রাম্যতা, গ্রামীণ পল্লীর চিত্র উপস্থাপনেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সম্ম্যহীন সমাজ ব্যবস্থায় খেটে খাওয়া মানুষ, যাদের চোখের জলের হিসেব কেউ রাখে না, তাদের দুঃখ ভরা জীবন কাহিনী কে তিনি প্রাধান্য দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রতি মুহূর্তে। উদাহরণ হিসাবে ‘পাহাড়ীয়া প্রেম’ কবিতার কথা তুলে ধরা যায়। এখানে দুর্দশাক্রিষ্ট গ্রামীণ জীবনের অনুপুঞ্জ রূপচিত্র স্থান পেয়েছে। যতীন্দ্রমোহন বাগচী একজন সত্যিকারের ভালো ও অনেক বড় মাপের মানুষ ছিলেন।

গ্রন্থপরিচয় :

১) ঘোষ, জ্যোতির্ময়। (১৯৮৫) 'যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড)। পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২) ঘোষ, জ্যোতির্ময়। (১৯৮৭) 'যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড) পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) চৌধুরী, গীতা। (১৯৭৮) 'আমার বাবা', দেশ পত্রিকা। ৮২ নম্বর পৃষ্ঠা।

৪) ভাদুড়ী, ঈশিতা। (২০১৬) 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী' সাহিত্য একাডেমি। কোলকাতা-০৯।

৫) রায়, অলোক। (একত্রিত সংস্করণ: মাঘ ১৪২৬ /জানুয়ারি ২০২০) 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা', (দ্বাদশ খন্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০০০৬। (পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ - ১২৫)

৬) রায়, অলোক। (পরিবর্ধিত তুলসী সংস্করণ: বই মেলা ২০১০) 'যতীন্দ্রমোহন কবি ও কাব্য', তুলসী প্রকাশনী, ৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯,

৭) সিংহ রায়, গোরা। (পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৪২৬/জানুয়ারি ২০২০) 'যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা', ভারবি প্রকাশনী, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৮) সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার। (দ্বাদশ প্রকাশ: মাঘ ১৪২৬) 'কল্লোল যুগ', এম. সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৯) হালদার, গোপাল। (মাঘ ১৪১৯) 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দ্বিতীয় খন্ড) অরুণা প্রকাশনী কলকাতা ৭০০০০৬।

১০) মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার। (সেপ্টেম্বর ২০২০/ অগ্নি ১৪২৭) 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ', দে'জ পাবলিশিং, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

১১) বসু, স্বপন। চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ। (২৯ শে মে ২০১৯) 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

১২) গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। (১৩৬৮) 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সোম পাবলিশিং, ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০০১২।

১৩) জালাল, খালিদ বিন। (ফেব্রুয়ারি, ২০২০/ফাল্গুন, ১৪২৬) 'নাটোরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', (প্রথম খন্ড) বই পত্র, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০ বাংলাদেশ।

১৪) পাল, সমর। (১৯৮৫) নাটোরের ইতিহাস, গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, বাংলাদেশ।

১৫) হক, ফজলুল। (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২/ মাঘ ১৩৯৮) 'মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়' (১৮৬৮-১৯২৬)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬) হোসেন, সেলিনা। ইসলাম, নূরুল। (মাঘ ১৪০৩ / ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭) বাংলা অ্যাকাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৭) 'কবিতা সংগ্রহ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (পৌষ ১৩৯৯ /ডিসেম্বর ১৯৯২)।